কুড়মি জাগৃতি



ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাতো

কুড়মি জাগৃতি

ডাঃ মথন চন্দ্র মাহাতো

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি

KUDMI JAGRITI

by

Dr. Mathan Ch. Mahato

(Ex. G.P. Level Homeopathic Medical Officer)

M.Sc (Zoology), M.A., D.M.S. (Cal)

* B.M.C.P. (Cerebral Palsy);- Trained in Jadavpur University
* Acupuncture Trained;- Jadavpur University
* Advance Course on Homeopathy (C.A.H.) ;- Council of Homeopathic Medicine, West Bengal
* Registered Acupuncturist (Part-A), By Council of Acupuncture Therapy (Govt. of West Bengal)
* Ex-House Physician and Surgeon ;- P.C. Memorial Homeopathic Hospital College (Calcutta)
* Family Welfare and Population Education Trained;- Indian Red Cross Society (Calcutta)
* Ayurved Ratna ; Hindi University.

* Baidya-Rajakia Aurvedic and Unani Chikissa Parisad Bihar.

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

বর্ণ সংস্থাপন : বুদ্ধেশ্বর মাহাত

প্রকাশনা : মূলনিবাসী কুড়মি সমাজ।

মুদ্রণে : সারনা প্রিন্টার্স, মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন, মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

দাম : ২০ টাকা

লেখকের অন্যান্য বই:-

১। বায়ো ও মঞ্জরী, ২। কুড়মি ফোরাম ফর কালচার এন্ড মুভমেন্ট, ৩। আকুপাংচার থেরাপি, ৪। O.B.C. জাগৃতি, ৫। হৃদয়ের কথা ও ব্যথা, ৬। আকুপাংচারে রোগ মুক্তি, ৭। Health for All (1st Part), ৮। কুড়মি জাগৃতি

উৎসর্গ :

সারনাধর্মী সকলের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

'কুড়মি জাগৃতি' বইটি প্রকাশ পেল। বইটিতে কুড়মি জাতির উৎপত্তি, সংস্কৃতি ও আন্দোলনের রূপরেখা ফুটে উঠেছে। কুড়মি জাতির উৎপত্তি বহুল চর্চিত বিষয়বস্তু। বিখ্যাত ইংরেজী মানববিজ্ঞানী ও গবেষক রিজলে, ডালটন, হান্টার ও ভাষাবিজ্ঞানী গ্রিয়ারসন প্রমুখ মহোদয়গণ কুড়মি জাতির উৎপত্তির বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের তৎকালীন চম্পা দেশে খেরওয়াড় জনগোষ্ঠীর ১২ টি জনজাতি একত্রে বসবাস করত। সেই ১৩ টি উপজাতির মধ্যে কুড়মি জনজাতি অন্যতম। মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বছর পূর্বে আর্য আক্রমনে তাঁরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। কুড়মি জনজাতি বনজঙ্গলে পালিয়ে বন কেটে বসতি গড়ে তোলে। এই কুড়মিকে জঙ্গলের কুড়মি বলা হয়। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭১ সালের জনগণনায় কুড়মি জাতিকে ঝারি কুড়মি বলা হয়। পরে এই কুড়মিকে টোটেমিক কুড়মি বলা হয়। বাংলার নবাব আলিবর্দির খাঁর সাথে মারাঠাদের চৌথ বিষয়ে যুদ্ধ বাধে। মারাঠাদের ঔরষে উপজাতি রমনীর গর্ভের সন্তান-সন্ততি মারাঠা কুড়মি জাতি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে সেইরূপ আর্যদের ঔরষে উপজাতি রমনীর গর্ভের সন্তান-সন্ততি আর্য কুড়মি জাতির সৃষ্টি করে। উৎপত্তির দিক দিয়ে কুড়মি জাতির মধ্যে তিনটি বিভাজন রেখা পরিস্ফুট। যথাক্রমে টোটেমিক কুড়মি, মারাঠা কুড়মি ও আর্য কুড়মি। মারাঠা কুড়মি ও আর্য কুড়মি জাতির কালচার বা সংস্কৃতি অন্যান্য জাতির কালচারের সাথে মিলেমিশে রয়েছে। কিন্তু টোটেমিক কুড়মি জাতির কালচার অন্যান্য জাতির কালচার থেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা রয়েছে। কুড়মি জাতি একটি পৃথক স্বতন্ত্র জাতি। একটি জাতির ৬টি ক্রাইটেরিয়া আছে। ক্রাইটেরিয়াগুলি যথাক্রমে- সমাজ, জাতি, ভাষা, লিপি, ধর্ম ও দেবস্থান। এই ৬টি ক্রাইটেরিয়া থাকলে একটি জাতি গণ্য হয়। কুড়মি জাতির নিজস্ব সমাজ, কুড়মালি ভাষা, কুড়মালি ধর্ম সারনা ও প্রাকৃতিক দেবদেবী গরাম ঠাকুর ও জাহির ঠাকুর ইত্যাদি। গ্রামের প্রান্তে পবিত্র স্থানে গরাম থান ও জাহির থান অবস্থিত। কুড়মি জাতি নিজেরাকে হিন্দু বলে মনে করে। কুড়মি জাতি কখনো হিন্দু ছিল না, আজও নেই। ধর্মের মোড়কে হিন্দুত্ববাদ কুড়মি জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুড়মি জাতি সারনা ধর্মে বিশ্বাসী, সত্য ও বাস্তব বস্তুতে বিশ্বাসী। সারনা ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন অনার্য গুরু শিব বা বুড়হা বাবা। বুড়হা বাবার কোনো মূর্তি নেই। তাই মূর্তি সংরক্ষণের জন্য কোনো মন্দিরের প্রয়োজন হয় না। সারনা ধর্ম সত্যের ধর্ম, কুড়মি জাতি প্রকৃতির উপর বিশ্বাসী। প্রকৃতির গাছ, পাথর, নদীনালাকে দেবতারূপে কল্পনা করে। কুড়মি জাতি সর্বপ্রাণবাদী বা অ্যানিমিষ্টে বিশ্বাসী।

কুড়মি জাতি জন্মলগ্ন থেকে ব্রিটিশ ভারতের ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তপসিলী উপজাতি (এস.টি) সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। ১৯৩১ সালের পর থেকে কুড়মি জাতি তপসিলী জনজাতি থেকে বাদ পড়ে। বাদ পড়াটি সংবাদটি স্বাধীন ভারতের ১৯৫০ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর কুড়মিরা জানতে পারে। তপসিলী জাতিতে পুনরায় (এস.টি) অন্তর্ভূক্তির জন্য কুড়মিদের বিভিন্ন সংগঠন সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ আবেদন নিবেদন আন্দোলনে পরিণত হয়। 'জিগিড়জিটা গবচন', 'ডহর ছেঁকা', 'মাহুর ডঁড় আগুয়ান' ও 'রেলটেকা' আন্দোলনগুলির নাম।

সংস্কৃতি কোন জাতির পরিচয় পত্র। কুড়মি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে মুলতঃ কৃষিকার্য বা কৃষিসভ্যতা থেকে। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজন হয় জমি, ধানবীজ, মাটি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল, জোয়াল ও লাঙ্গল টানার জন্য গবাদি পশু। এই উপাদানগুলি জুগিয়েছে কুড়মিদের আদি দেবতা বুড়হা বাবা। তাঁর নির্দেশে সমগ্র কৃষিকার্য পরিচালিত হয়। বছরের প্রারম্ভে জাড় মাসের ১লা তারিখ বুড়হা বাবার নাম স্মরণ করে জমিতে আড়াই পাক আঁতর কেটে কৃষিকাজ শুরু হয়। চইত বা মধু মাসে চড়ক সংক্রান্তিতে বীজের আঁকুর সম্ভাবনা ধানবীজগুলিকে আলাদা করে রোপনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। কাজে সফল হওয়ার জন্য আনন্দে তাঁরা ছৌ-নৃত্য প্রদর্শন করে। ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ বা রহিন দিনে খরা মাসে সংরক্ষিত ধানবীজগুলিকে জমিতে বপন করে। আসাড় বা বেরসা মাস ও সরাবন মাসের প্রারম্ভে জলা জমি মেরামত করে চারাগাছগুলি রোপন করা হয়। ভাদর বা করম মাসে ধানগাছগুলি বেড়ে বেড়ে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এই সময় ম্যাচুর চারাগাছগুলি ধানশীষ প্রসবের জন্য, প্রসবের কলাকৌশলগুলি কুড়মি কন্যাদের নিকট থেকে করম গানের মাধ্যমে শিখে নেয়। জিতা উৎসবে কুড়মি সধবা-বিধবা প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাগণ কুড়মিদের আদি দেবতা সূর্য্যের কাছে প্রার্থনা করে যেন উৎপাদিত ধীন শীষে ধানগুলো পুষ্ট ও মিষ্টি হয়। যেন ধানশীষের ধানগুলো যেন আগড়ী ও খেঁকড়ি না হয়। কাতিক বা মাইসর মাসে খেত ভর্ত্তি কাঁচা-পাকা ধান। এই প্রসেস গুলি সম্ভব হয়েছে বুড়হা বাবা প্রেরিত গবাদি পশু ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মাধ্যমে। তাই কৃষিকাজে সহায়ক গবাদি পশুকে বাড়তি সেবা যত্ন দেওয়া এবং গরয়া পিঠার মাধ্যমে বুড়হা বাবাকে তাঁদের আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা জানানো কুড়মি জাতি নেগাচার বলে মনে করে। আঘন বা মাইসর মাসের সংক্রান্তিতে খামারে ধানগাছ ভর্ত্তি পালুই। ধানগাছের শীষে পরিপুষ্ট ম্যাচুর সোনালী রঙের ধান কুড়মি জাতির আনন্দ ধরে না। ম্যাচুর পুষ্ট সোনালী রঙের ধানে শীষ ভরে গেছে। এই পুষ্ট সোনালী ধানকে কুড়মি জাতি আপন কন্যাজ্ঞানে দেখে। ম্যাচুর ধানটিকে তারা টুসু বলে ডাকে। টুসুকে চাক্ষুষ দেখার যুবতী কন্যার আদলে খড়, মাটি নির্মিত ১-২ফুট দীর্ঘ প্রতিমা বানানো হয়। টুসু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মকরের তিনদিন পূর্বে ঋতুমতী হয়। উহা সৃষ্টির লক্ষন। তারা টুসুকে বিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করে। ঋতুর প্রথম দিন গুলিকে আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি বলা হয়। এই দিনগুলিতে টুসুকে বিভিন্ন পোশাকে ও অলঙ্কারে সাজুগুজু করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য টুসুকে পরিবেশন করা

হয়। কুড়মিরাও এই মেনু থেকে বাদ পড়েনি। পুস মাস সংক্রান্তিতে টুসুকে চৌড়লে চড়িয়ে টুসু গান গেয়ে কোন জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। এখানে টুসুর অর্থ হল পুষ্ট ম্যাচুর ধানবীজ। টুসু থাপনে পুষ মাসের সংক্রান্তির তিনদিন পূর্বে ধানবীজ অঙ্কুরিত হয়। সেইজন্য আগামী মরশুমে অধিক ফলনের জন্য ধানবীজটিকে কোন জলাশয়ে পুঁতে দেওয়া হয়। এই পর্বটি কে টুসু ভাসান বলা হয়। সুতরাং টুসু উৎসব মূলতঃ কুড়মি জাতির কৃষিভিত্তিক উৎসব।

বর্তমানে কুড়মি উৎসবগুলি আপন স্বাতন্ত্র্য থেকে সরে যাচ্ছে বা সরানো হচ্ছে। কুড়মি জাতি জানে সত্য ঘটনার সাথে, মিথ্যা ঘটনার সংমিশ্রন ঘটিয়ে আসল ঘটনাকে বিকৃত করা হয়। কিছু কিছু উৎসবে ওইসব দেখা যায়। চড়ক উৎসবে কুড়মি জাতির আদি দেবতা বুড়হা বাবার কাছে ধানগুলির অঙ্কুরিত হওয়ার গুন পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে চড়ক পূজাতে আর্য সভ্যতার মন্দিরে থাকা মহাদেব শিবের উপাসনা ও আরাধনা করা হয়। আনুসাঙ্গিক কার্য্যাদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মতে সু-সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটা সম্ভব হয় কুড়মিদের অতীত ইতিহাস না জানা চাপা দেওয়া।

জিতা উৎসবে সধবা-বিধবা মহিলাবৃন্দ তাঁদের আরাধ্য দেবতা সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করে যেন শীষের ধানগুলি পরিপুষ্ট ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত হয় এবং অপর পক্ষে শীষের ধানবীজগুলি যেন আগড়া ও খেঁকড়ি না হয়। বর্ত্তমানে জিতা উৎসব আর্যদেবতা জীমুত বাহনের অনুপ্রবেশে জিতাষ্টমীতে পরিণত হয়েছে। গো-বন্দনা বা বাঁধনা উৎসব কৃষিদেবতা বুড়হা বাবার ও গবাদি পশুর উৎসব মাত্র। বর্ত্তমানে আর্যদেবতা কালী মাতার আগমনে বাঁদনা উৎসব ম্লান বা ফ্যাকাসে। মকর উৎসবে কৃষি সভ্যতার ধানবীজ মানবীকন্যার রূপ পেয়েছে।

বইটি শেষ করলাম। বইটি প্রকাশের জন্য যাঁরা উৎসাহ প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো আমার হার্দিক অভিনন্দন।

Dr. Mathan Chandra Mahato
At. Dulmi (Shib Mandir Gali)
P.O.- Dulmi Nadiha, Dist.-Purulia
At. Manbazar Prince Road
P.O.-Manbazar, Dist.-Purulia (W.B.)
Mob.:9332106875
২৩ সরাবন (বেরসা মাস) ২০২৩
আদি বসকইত দিন

কুড়মি জাতির উৎপত্তি ও আন্দোলন

আর্যরা ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসর পূর্বে ভারতে আসে। আর্যপূর্ব যুগে প্রোটোঅস্ট্রলয়েড জনসমাজের উত্তরসূরী অসুর, সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, মাহালি, কুর্মি, লোধা, শবর, কোল, বিরহড়, কুরকু ও কোড়া এই তেরোটি জাতি ভারতে বাস করত। এই জাতিগুলি হল খেরওয়াল জনগোষ্ঠী। মিত্রতা, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংঘবদ্ধ সমাজজীবন ছিল তাঁদের। বসতি গড়ে উঠে তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে। উৎপাদিত সম্পদ বা শস্য যাতে সুষ্ঠভাবে সমবন্টনের মাধ্যমে সকলেই ভোগ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তারা। বিশ্ব প্রকৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক সারি ধর্ম বা সত্য ধর্মের প্রবর্তন করে তারা। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও নীতিবোধ এই দুটো ছিল সমাজের স্তম্ভ। আদি ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার নগর বা বানিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে মেহরগড় বা হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োতে। দ্রাবিড় সভ্যতার সন্ধান পেয়ে বিদেশী আর্যরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং দ্রাবিড় সভ্যতা ধ্বংস করে। তারা প্রথমে উত্তর পশ্চিমে ভারতে, সেখান থেকে মধ্য ভারত ও দক্ষিন ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ইরান থেকে ভারতে আসার সময় তারা ঘোড়ায় চড়ে ভারতে আসে। তাদের সঙ্গী সাথী ছিল বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও পৌষ্য ঘোড়া। নারী জাতি সাথে ছিলনা, থাকলেও অতি নগন্য। ভারতে এসে আর্যরা নিজেদের দেব বলে পরিচয় দেয়। ভারতীয়দের কাছ থেকে তারা কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও সাহিত্য প্রভৃতি আয়ত্ত করে। পরে তারা আর্য সাম্রাজ্য কায়েম করে। D.N.A. পরীক্ষা করে দেখা গেছে তারা বিদেশী। খেরওয়ালরাকে অনার্য বলা হয়। তারা ভারতের ভূমিপুত্র। ভারতের জল, জমি, জঙ্গল তাদের অধিকার। তারা নিজেদের হড় বলত। তারা ভারতের মুলনিবাসী। জল, জমি, জঙ্গল অধিকার নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত। উহা ক্রমশঃ যুদ্ধে পরিণত হত। ঐ যুদ্ধে অনার্যরা ধাপে ধাপে পরাজিত হয়। অনার্যদের বেশী সংখ্যক সদস্য আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে। তারা আর্যদের সেবায় নিযুক্ত হয়। পরাজিত অনার্যদের শূদ্র রূপে সমাজে চিহ্নিত করা হয়।

এরপর আর্যরা সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করে। পরাজিত অনার্য রাজাদের

রমনী লুট ও ধর্ষণ করে তাদের গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রজ সন্তানগণ যে জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়। তাদের হাতে যুদ্ধ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। আর্য সম্ভোগে পরাজিত মূলনিবাসী মহিলার গর্ভের সন্তানরা যে জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদের বৈশ্য বলা হয়। এদের হাতে ব্যবসা বাণিজ্যের ভার দেওয়া হয়। সমাজের সম্মানজনক পেশা, অধ্যাপনা ও পৌরহিত্য নিজেদের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ নিয়ে আর্য সমাজ গড়ে উঠে। পরাজিত অনার্যদের বৃহত্তম অংশ শূদ্র সম্প্রদায়। মন্ডল কমিশনে এরা ৫২ শতাংশ অর্থাৎ শতকরা ৫২ জন। এরা তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হল। পরে এরা নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে ব্রাহ্মনদের দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, ধর্ম যাবতীয় সংস্কৃতি গ্রহন করে। পরাজিত শূদ্ররা নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলতে থাকে। বর্তমানে মন্ডল কমিশন ও সংবিধানে এরা ও.বি.সি সম্প্রদায়ভূক্ত।

পরাজিত অনার্যদের ক্ষুদ্রতম একটা অংশ বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এরাকে অতি শূদ্র বলা হয়। মন্ডল কমিশনে এই জাতি ১৫ শতাংশ অর্থাৎ একশোর মধ্যে ১৫ জন জনসংখ্যা অনুসারে। সংবিধানে এই জাতি তপশিলী জাতি হিসাবে পরিচিত অর্থাৎ এস.সি সম্প্রদায়ভূক্ত।

বন জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া অতি শূদ্র জাতিটি বনজঙ্গলের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তারা আর্যদের শরনাপন্ন হয়। আর্যরা এই জাতিকে অস্পৃশ্য রূপে ঘোষণা করে। এরা হল অতি শূদ্র।

অবশেষে মূলনিবাসী সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশটি পরাজিত হয়ে বন জঙ্গলে পালিয়ে যায়। আর তারা আর্যদের লোকালয়ে ফেরেনি। মূলনিবাসী সমাজের এই ক্ষুদ্রতম অংশটি আর্য সমাজের বাইরে। বর্তমানে মন্ডল কমিশনে এই তপশিলী উপজাতিটি জনসংখ্যায় ৭.৫ শতাংশ অর্থাৎ একশোর মধ্যে সাড়ে সাত জন। সংবিধানে এই উপজাতিটি তপশিলী উপজাতি হিসেবে অর্থাৎ এস.টি সম্প্রদায়ভূক্ত।

এই এস.টি সম্প্রদায় জনগোষ্ঠী বন কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ করে ও তাদের সংস্কৃতি গড়ে তুলে। এই এস.টি. জনগোষ্ঠী হল যথাক্রমে সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালি, কড়া, হো, তুরি, অসুর, কোল, কুরকু, বিরহড়, কোরওয়া, ভূমিজ ও কুড়মি (মাহাত) উপজাতি গোষ্ঠী সমূহ। এই উপজাতি গুলি খেরওয়াল নামেও পরিচিত। আদিতে দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত সত্যের পূজারী সারনা ধর্মাবলম্বী এরা।

বর্তমানে সংবিধানে এই জাতি গুলিকে তফসিলী উপজাতি রাখা হয়েছে কুড়মি জাতি বাদ দিয়ে। মন্ডল কমিশনে জনসংখ্যা অনুযায়ী এরা ৭.৫ অর্থাৎ একশোর মধ্যে সাড়ে সাত জন। কুড়মি জাতি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত খেরওয়াল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিল। ব্রিটিশ ভারতে দেখা যাচ্ছে এই তেরোটি উপজাতি তফসিলী উপজাতি অর্থাৎ এস.টি. সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

এখন আমাদের কুড়মি জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই কুড়মি জাতি দ্রাবিড় সভ্যতার খেরওয়াল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। তফসিলী উপজাতির লক্ষণ সমূহ কুড়মি সমাজে বিদ্যমান।

বনজঙ্গলে বাস করা কুড়মি জাতিকে জঙ্গল কুড়মি বা ঝারি কুড়মি বলা হয়। বৃটিশ সেন্সাসে ১৮৭১ সালে ঝারি কুড়মির উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক মতে প্রমানিত ঝারি কুড়মি বর্তমান কালের কুড়মিদের পূর্বসুরী।

কুড়মি জাতির মধ্যে স্থান-কাল অনুযায়ী বিভিন্ন উপবিভাগ রয়েছে। মানভূম জেলাতে কুড়মি জাতির চারটি উপবিভাগ আছে। যথাক্রমে কুরুম বা আসল কুড়মি, শিখরিয়া, মাঘরিয়া ও বগ সারিয়া। বিহারের কুড়মিদের উপবিভাগ সাতটি যথাক্রমে আয়োধিয়া, ছাঁওয়ার, ঘামেলা, জয়সওয়ার ইত্যাদি। উড়িষ্যার কুড়মিদের উপবিভাগ চারটি। যথাক্রমে গায়সার, মৈসাসার, বগসাঁর ও গাড়া সার। কুড়মি শব্দটি নানাভাবে প্রচলিত। যথাক্রমে কুনবি, কুরমি, কুরুম ও কুরুমানিক। কুড়মিদের অনেকগুলি পদবী আছে যেমন-চৌধুরী, মহারায়, রাই, মাহাত, বৈরাগী ও সিনহা।

কুড়মি জাতি মূলতঃ ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সেন্সাস রিপোর্টে তফসিলী জনজাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। অর্থাৎ তারা এস.টি. সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে কুড়মি জাতিটি ১৯৩১ সালে এস.টি তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। তালিকা থেকে বাদ পড়ার কারণগুলি আলোচনা করা চলতে পারে। ভারতে মুসলমান আমলে আর্য ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাঁরা কখনও হিন্দু ছিলেন না। হিন্দু শব্দটি মুসলমানদের দেওয়া শব্দ। এটা ফার্সি শব্দ। যার অর্থ হীন, নীচ বা চাকর শ্রেণী। আর্যরা বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মন। মুসলমান সম্রাটগণ ভারতীয় মুলনিবাসীকে হিন্দু বলতে শুরু করে। যদিও মুলনিবাসীরা আপন আপন গোষ্ঠী ধর্মে বিশ্বাসী। মুলনিবাসীরা কখনও নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে না। হিন্দু শব্দটি মুলনিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া শব্দ। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের একমাত্র পরিচয় আর্য ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে ১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রে নাসিক শহরে হিন্দু মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু মহাসভাতে আর্যদের আর একটি পরিচয় হল হিন্দু।

যদিও আর্যব্রাহ্মণগণ মনেপ্রাণে হিন্দু শব্দটি গ্রহণ করতে পারেনি। আর্য ব্রাহ্মণদের এই রূপ দুটো অবস্থান কেন হলো তা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

১৯১৭ সালে ইংল্যান্ডে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। ভারত ইংল্যান্ডের উপনিবেশ। তাহলে ইংরেজ শাসিত ভারতে ঐ আন্দোলন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। হলেও ঠিক তাই। ১৯১৯ সালে চালু হল ফার্স্ট ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট। আইনের সাথে সকলে সমান। আর্যদের সংবিধান মনুসংহিতা কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হল। এই সময় কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব ঠিক হয়। সেই সময় ভারতের চালিকাশক্তি ছিল কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দলের ব্রাহ্মণ সদস্যগণ বুঝতে পারল ভারতে নির্বাচন লাগু হলে মুলনিবাসী জাতিগুলি ভোটাধিকা পেয়ে যাবে। মুলনিবাসীরা নির্বাচনে পৃথকভাবে বা জাতিগতভাবে অংশগ্রহণ করলে আর্যদের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আকারে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা মুলনিবাসীরা আর্যদের ভোট দেবেনা। মুলনিবাসীরা পৃথকভাবে নিজের জাতির প্রতিনিধি আইন সভায় পাঠাবে। কেননা মুলনিবাসীরা জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশ। আর্য জাতি ১৫ শতাংশ। এর মধ্যে আর্যব্রাহ্মণ ৩.৫ শতাংশ। ইহা ১৯৯০ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট (১ম খন্ড, পৃ-৫৬)। আর্যরা আইনসভায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেনা। তাই তাঁরা নাসিকে হিন্দু মহাসভা করে আর্যরা হিন্দু হয়ে গেলেন। মুলনিবাসীদের হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হল। আর্যরা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে হিন্দু বানিয়ে ফেলল। আর্যরা বুদ্ধিমান, তাঁরা জানে যদি তাঁরা আর্যসমাজের নামে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে, তাহলে তাঁরা নির্বাচনে হেরে যাবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে ও কৃতকার্য করতে হলে একটি বৃহত্তর পরিধিতে ভারতের সব সম্প্রদায়গুলিকে একটি ছাতার তলায় আনতে হবে। এইরূপ তাঁরা একটি সংগঠন গড়ল। যার নামকরণ হল হিন্দু মহাসভা। হিন্দু মহাসভায় সব ভারতীয় জাতির সদস্যবৃন্দ জুড়ে গেল। হিন্দু তত্ত্বের মোড়কে আর্য অনার্য এক হয়ে গেল। লক্ষ্যণীয় বস্তু ১৯২২ সালের পূর্বে মুলনিবাসীদের আর একটি পরিচয় ছিল নিজস্ব সম্প্রদায়ের নামে। ১৯২২ সালের পর মুলনিবাসীদের আর একটি পরিচয় সংযোজন হল যার নাম হিন্দু। তাহলে মুলনিবাসীদের দুটো পরিচয় হল। একটি হল নিজস্ব সম্প্রদায়ের নামে আর দ্বিতীয়টি হল সৃষ্টি করা হিন্দু নামে। মুলনিবাসীদের সামাজিক অনুষ্ঠান, আচার ব্যবহার, বিবাহ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় সম্প্রদায়গতভাবে প্রথম পরিচয়ে মাধ্যমে। সামাজিক প্রয়োজনে

হিন্দু পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে নির্বাচনে জিতে এম.এল.এ বা এম.পি হতে হবে। আর্য নামে প্রচার করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসবে না। হিন্দু নামের দ্বারা আর্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেতা হয় এবং বেশী সংখ্যক ভোট পায়। তার জন্য অল্প সংখ্যক আর্য ব্রাহ্মণ বহুসংখ্যক লোকের ভোটে জিতে সকলের উপর কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া কুড়মি সমাজের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। কুড়মি সমাজের অভিজাত ও মোড়ল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণবাদ, দেব-দেবীর পূজাঅর্চনা, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং অপর কুড়মি সদস্যকে প্রভাবিত করে। কুড়মি সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণীকরণ বা হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তারা গ্রামে গঞ্জে হিন্দু মহাসভার আয়োজন করে হিন্দু সদস্য বৃদ্ধির জন্য আবার অনেকে অবাস্তব ক্ষত্রিয় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার ফলে কুড়মি ক্ষত্রিয় আন্দোলন শুরু হয়। কুড়মি সমাজে কিছু কিছু উপাদানের যোগ বিয়োগ হল। সমাজে যোগ হল ব্রাহ্মণ্যবাদী কৃষ্টি বা কালচার। বিয়োগ হল মুরগী নিধন, দ্বিতীয় বিবাহ বা সাঁঘা। মুরগী নিধনের মূল কারণ হল কুড়মি সংস্কৃতি ধ্বংস করা। মুরগী কুড়মিদের চিরাচরিত গৃহপালিত পৌষ্য জন্তু। উৎসব, পূজাপার্বনে মুরগীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। পূজার সময় গরাম থান, গোঁসাই থান, জাহির থান, বাঁদনা পরবে তুলসী থানে মুরগীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। ক্রমাগত কুড়মি সমাজে দুটো ভাগ সৃষ্টি হয়। যথাক্রমে একটি হল ব্রাহ্মণ্যবাদী কুড়মি ও অপরটি হল টোটেমিক কুড়মি। যারা প্রকৃতির উপর ও সত্যের উপর আস্থা, ভরসা ও বিশ্বাস রাখে তারা হল টোটেমিক কুড়মি।

ইংরেজ সরকার ভারত শাসনের সময় সেন্সাস বা জনগণনা প্রক্রিয়া শুরু করে। উদ্দেশ্য হল ভারতে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির অবস্থান ও তাদের সংখ্যা নিরুপন করা। ১৮৭১ সালে ইংরেজ সরকার পদ্ধতিগতভাবে প্রথম জনগণনা শুরু করে। এই জনগণনাতে খেরওয়াল জনগোষ্ঠির তেরোটি জাতি লিপিবদ্ধ ছিল। জাতিগুলি হল যথাক্রমে অসুর, মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল, বিরহড়, খেড়িয়া, শবর, কোড়া, কুরকু, মাহালি, ভূমিজ, তুরি ও কুড়মি।

১৯১৩ সালের ২ রা মে হোম ডিপার্টমেন্ট ৫৫০ নং নোটিফিকেশনে অন্যান্য জনজাতির সঙ্গে কুড়মি জাতিকে জনজাতি হিসাবে নোটিফাইড করা হয়েছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন আদম সুমারিতে এই কুড়মি জাতিকে কখনও

অ্যাবোরজিনাল ট্রাইব, কখনো অ্যানিমিষ্ট আবার কখনো প্রিমিটিভ ট্রাইব হিসেবে দেখানো হয়েছে। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই কুড়মি জাতি তফসিলী জনজাতির মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে হিন্দুকরণের জন্য কুড়মি জাতি তফসিলী জনজাতি থেকে বাদ পড়ে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে কুড়মি জাতি বাদ দিয়ে ১২ টি জনজাতি এস.টি সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু তাঁর অর্ডার S.R.O-510 6th September তফসিলী আদিবাসী তালিকা প্রকাশ করেন। ঐ তালিকাতে দেখা যায় উপরে উল্লিখিত ১২টি জাতি এস.টি সম্প্রদায়ভূক্ত আছে। অর্থাৎ ১৯৩১ সালের তফসিলী তালিকা বহাল আছে। কেবল মাত্র কুড়মি জাতি তফসিলী জনজাতি (এস.টি) তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এটা সরকারের প্রবল বঞ্চনা। এ বঞ্চনার প্রতিবাদে সমগ্র কুড়মি সমাজ ধিক্কার জানাই ও কুড়মি জাতিকে পুনঃউদ্ধারের জন্য কতেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয় পরে যা আন্দোলনে পরিণত হয়।

টোটেমিক কুড়মি সমাজের গৃহীত দাবীগুলো হল-কুড়মি জাতিকে পুনরায় এস.টি তালিকাভূক্ত, কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফশীল তালিকাভূক্ত, সারনা ধর্মের কোড চালুকরণ ও স্বাভিমান প্রতিষ্ঠা করা। উক্ত দাবির সমর্থনে নিম্নলিখিত আন্দোলনসমূহ বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হয়।

১। ২০১৫ সালের তারিখ ২৫, ২৬, ২৭ সেপ্টেম্বর টামনা স্টেশনের কাছে ডুঁড়কু মোড়ে শহীদ রঘুনাথ ময়দানে কুড়মি সমাজের প্রথম আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের রূপরেখা দুটি ভাগে বিভক্ত।

২। ২০১৭ সালে ২০ই সেপ্টেম্বর "ডহর ছেঁকা" আন্দোলন। ডহর-এর অর্থ ছোট রাস্তা। ছোট রাস্তা জ্যাম করে প্রতিবাদ করা ও সরকারের দৃষ্টিগোচর করা।

৩। ২০১৮ সালে ৬ ই মার্চ "জিগিড় জিটা গবচন" আন্দোলন। জিগিড়জিটা-র অর্থ হল নাছোড়বান্দা। অর্থাৎ নাছোড়বান্দা বসে থাকা আন্দোলন।

৪। ২০১৮ সালে ২১-২২ শা নভেম্বর দিল্লীতে "মাহুর ডঁড় আগুয়ান"। বিভিন্ন রাজ্যের কুড়মি সদস্য ট্রেন রিজার্ভ করে দিল্লীর রাস্তা প্রীতিপূর্ণ সহকারে জ্যাম করা ও সরকারের দৃষ্টি গোচর করা।

৫। ২০২০ সালে "ডহরে করম" আন্দোলন। কুড়মি কুমারী মেয়েদের নাচেগানে প্রীতি পূর্ণ সহকারে রাস্তা জ্যাম করা ও সরকারের দৃষ্টিগোচর করা।

৬। ২০২২ সালে ২০ সেপ্টেম্বর "রেল রোকো" আন্দোলন। কুশট্যাঁড় ও

খেমাশুলিতে রেল স্টেশন শান্তিপূর্ণ ভাবে ৫ দিন রেল অবরোধ। দাবী পূরণের আশ্বাস দিলে আন্দোলন স্থগিত। এরপর পরবর্তী আন্দোলন সময় কথা বলবে।

প্রাক আর্যযুগে সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালি, কড়া, হো, তুরি, অসুর, বিরহড়, খেড়িয়া, শবর, কোরওয়া, ভুমিজ ও কুড়মি (মাহাত)। এই তেরোটি জনজাতি হল প্রাক আর্য প্রোটো অস্ট্রলয়েড জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরী ও খেরওয়াল সম্প্রদায়। আর্য-অনার্য সংগ্রামে এই তেরোটি জনজাতি পরাজিত হয়ে বনজঙ্গলে বসতি গড়ে তুলে ও নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। এরা সকলে প্রকৃতি পূজারী সারনা ধর্মাবলম্বী। এই বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কুড়মি একটি জনজাতি। এই কুড়মিকে ঝারি কুড়মি বলা হয়। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭১ সালের জনগণনাতে ঝারি কুড়মি বা জঙ্গলের কুড়মি উল্লেখ আছে। এই কুড়মি জাতি তত্ত্ব ও সমৃদ্ধ জনজাতি।

কুড়মি সংস্কৃতি

কুড়মি জাতির দেব ভাবনা:

আর্যদের আগমনে ভারতে নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। কুড়মি সম্প্রদায় বিশেষ করে টোটেমিক কুড়মি জাতি পাহাড়ের কোলে অরণ্যভূমিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করত। সময় সময় ঝড় বিদ্যুৎ, চমকানি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারি, মোড়ক ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ দেখা দিলে তারা ভয় পেত। ভয় থেকে ভক্তি, ভক্তি থেকে ধর্ম, ধর্ম থেকে দেবদেবীর উদ্ভব হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ঐ দুর্যোগগুলির সন্তুষ্টি প্রয়োজন। আর্যরা তাদের এই দুর্বলতা ধরে ফেলে। তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিকে এক একটি বিভাগে পরিণত করে এবং বিভাগের হেড এক একটি দেবতা বানায়। আর্য দেবতা বর্তমানে সংখ্যায় প্রচুর। ঐ দেবতা গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করলে অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায় মারফত পূজা, অর্চনা করলেই দেবাগণ সন্তুষ্ট হন ও সমাজে সুখ শান্তি বিরাজ করবে। এই দেব ধারণা মুলনিবাসীদের মনে উদয় হয়। কিন্তু মুলনিবাসীদের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ টোটেমিক কুড়মি সম্প্রদায় এই থিওরী মানতে নারাজ। টোটেমিকরা সত্যের পূজারী, তাদের আরাধ্য দেবতার সান্নিধ্য পেতে হলে তারা সরাসরি দেবতার নিকট প্রার্থনা করে ও মনের কথা ব্যক্ত করে। এখানে কোন মিডিলম্যান বা পুরোহিতের প্রয়োজন

হয়না। তাদের উৎসবগুলি কৃষিভিত্তিক, কোন দেবতাকেন্দ্রিক নয়। উৎসবগুলির হদিস নিচে দেওয়া হল।

গরাম পূজা : এই পূজাটি মূলতঃ ১লা মাঘ থেকে শুরু হয়। ১লা মাঘে সূর্য্যের উত্তরায়ন পথ পরিক্রমা শুরু হয়। কুড়মি সম্প্রদায় তাদের ব্যবহারিক জীবনে জানতে পারে সৃষ্টির জন্য পুরুষ প্রকৃতি এবং মাতৃ প্রকৃতি বা স্ত্রী বিশেষ প্রয়োজন। এই দুইয়ের ব্যতিরেকে সৃষ্টি সম্ভব নয়। পুরুষ প্রকৃতিকে বা পুরুষকে তারা বুড়হাবাবা এবং স্ত্রী প্রকৃতিকে তারা বুড়হা মা বলে চিহ্নিত করে।



তাহলে সৃষ্টির আদিতে বুড়হাবাবা ও বুড়হা মায়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই বুড়হা বাবা ও মাকে শিবপার্বতী ও বলা হয়ে থাকে। এই কৃষকদের শিব পার্বতী, আর্যদের শিব-পার্বতী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কুড়মিদের শিব পার্বতী মন্দির পছন্দ করে না। কৃষি খেতে থাকতে পছন্দ করে। কুড়মি সম্প্রদায়ের আদি দেবতা। আর একটি দেবতা হল সূর্য। সূর্যকে তারা ধরম ঠাকুর বলে। ধরম ঠাকুর আলোর উৎস, প্রকৃতিতে আলো ও তাপ উৎপন্ন করে। এই আলো ও তাপ ধান শস্যের অঙ্কুরউদ্গামে বিশেষ প্রয়োজন। আলো ছাড়া কোন বস্তু দৃশ্যমান নয়। আর একটি দেবতা হল বায়ু দেবতা, কুড়মিরা এই দেবতাকে বাঘুত বলে। বাঘুত দেবতার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বিদ্যমান। অক্সিজেন মানুষের শ্বাসকার্যে, কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ জগতে বিশেষ কাজে লাগে। জীবন ধারণে বাঘুত ঠাকুর অতি বাস্তব। জলের দেবতাকে বানসিং বলা হয়। জল ছাড়া জীবন বাঁচে না। তাহলে বুড়হাবাবা, বুড়হা মাই, ধরম ঠাকুর, বাঘুত ঠাকুর ও বানসিং ঠাকুরকে একত্রে গরাম ঠাকুর বলা হয়। এই পাঁচটি ঠাকুরের সম্মিলিত রুপ। গ্রামের কোন এক প্রান্তে পবিত্র স্থানে এই পাঁচটি ঠাকুরের পূজা এককভাবে বা সম্মিলিত রূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পূজাটিকে গরাম পূজা বলা হয়। সাধারণতঃ এই পূজা ১লা মাঘ ও আষাঢ় মাসের সাত তারিখে হয়ে থাকে। গরাম ঠাকুর কুড়মি সম্প্রদায়ের লোগো। কৃষিকর্মের সূচনাতে ও বিভিন্ন প্রকার কুড়মি আন্দোলনে গরাম ঠাকুরের জয়ধ্বনি

দেওয়া হয়। গুঁসাই রাই কুড়মিদের আর একটি ঠাকুর বা দেবতা। গ্রামের প্রান্তে বাইরের শত্রু ও বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধি গ্রামে ঢুকতে দেয় না, প্রতিরোধ করে। চাঁদরাই আর একটি দেবতা। ইহা গ্রামের পরিবেশ শীতল রাখে। কৃষিকার্যে এই দেবতাগুলোর অবদান অপরিসীম।

কুড়মি কালচারের উপাদান:

১) যাতরা উৎসব : কুড়মি পঞ্জিকাতে মাঘ মাস বছরের প্রথম মাস ও কৃষিকাজের শুভ মাস বলে বিবেচিত হয়। ১লা মাঘে কৃষিকাজের সূচনা করা হয়। যাত্‌রা উৎসব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অভিহিত। কোন স্থানে আখ্যান যাত্‌রা, আবার কোন স্থানে হাল পুনহা নামে পরিচিত। ১লা মাঘ সূর্য উত্তর পথে অবস্থান শুরু করে। কুড়মিরা সূর্যকে ধরম ঠাকুর বলেও মনে করে। সূর্যের আলো ও তাপ ধান বীজের অঙ্কুর উদ্গামে বিশেষ প্রয়োজন হয়। ১ লা মাঘ শুভ দিন তাই তারা যথারীতি কুড়মি কালচারের নিয়ম নীতি মেনে হাল পুইনহা করে। বাড়ির কর্ত্তা বা পুরুষ সদস্য ধানী জমিতে বাম নেগাচারে গরু বা কাড়ার লাঙ্গলে আড়াই পাক আঁতর কাটে এবং কৃষিকাজের সূচনা করে। কুড়মি সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হল বাম নেগাচারে কৃষিকাজ সম্পন্ন করা। কৃষিজমিতে তারা ডানদিক থেকে বাম দিকে আঁতর কাটে। সকাল বেলা মহিলারা ডান হাত ডান দিক থেকে বৃত্তাকারে বাম দিকে ঘুরিয়ে মাড়ুলি দেয়। বৃত্তাকার মাড়ুলিটি ধরম ঠাকুর তথা সূর্যের প্রতীক। এই শুভদিনে গরাম থানে গরাম পূজাও সেরে নেওয়া হয়।

২) চড়ক উৎসব : চড়ক উৎসবটি সাধারণতঃ চৈত্র সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই দিনটি কৃষি আদিদেবতা বুড়হাবাবার জন্মদিবস হিসেবেও প্রতিপালিত হয়। চড়ক উৎসবটি চার দিনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা ফলার, জাগরণ, ভগতাফুঁড়া ও তেলহলদা। ফলারের দিনে বুড়হাবাবার মন্ডপে ঢাকের বাজনা বাজে ও ভক্তদের অর্থাৎ ভগতাদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা বুড়হাবাবার সমীপে কাঁচা ভিজা ছোলা, আমের কুশি ও গুড় মিশিয়ে প্রসাদ রুপে অর্পন করা হয়। গত মরশুমের সংরক্ষিত ধান শস্যগুলি বুড়হাবাবার কাছে রাখা হয়, তাদের অঙ্কুরিত গুন পরীক্ষার জন্য। পর দিবস গাঁজন বা উপাস। উপাসী দিনে কুড়মি সম্প্রদায় জেনে নেয় কোন কোন শ্রেণীর ধান অঙ্কুরিত হওয়ার গুন রাখে। যে সব ধান শস্য দানা অঙ্কুরিত হওয়ার গুন আছে বা যেগুলো অঙ্কুরিত হবে সেগুলোকে পৃথক রাখা হয়। পরে বুড়হাবাবার কাছে ধূলি মাখিয়ে বপনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা

হয়। বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার ধাপ বা কৌশলগুলি জানার পর তারা আনন্দে মেতে ওঠে। দেহের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করে। এই নৃত্য থেকে ছৌ নাচের উৎপত্তি ঘটেছে।

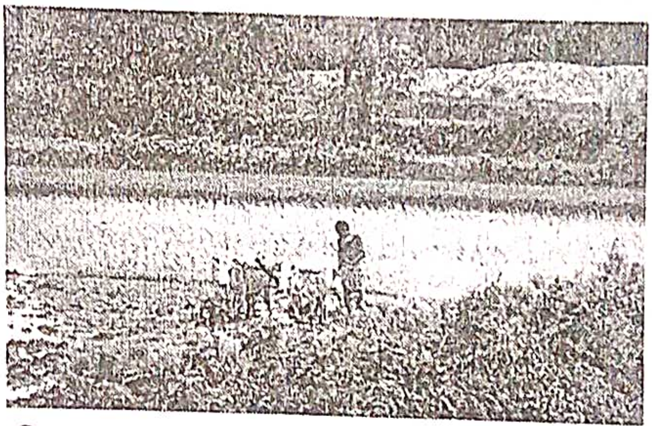
যদিও বর্তমান বিভিন্ন জাতির অংশগ্রহনে ছৌ শৈলীর পরিবর্তন হয়েছে, তবুও ইহার মৌলিকতা হারায়নি। ছৌ নৃত্য সাধারণত: খোলা আকাশের নীচে খোলা মাঠে রাত্রিবেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শ্রোতা ও দর্শকমন্ডলী বৃত্তাকারে পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলে দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রে বসে ছৌনৃত্য উপভোগ করে। আসরটি হয় গোলাকার, জমিনের উপর থাকে ধূলিকণিকার আবরণ। নৃত্যের সময় ধূলিকণা উড়তে থাকে। ছৌ নৃত্যে তিনটি অংশ বিদ্যমান। যথাক্রমে নৃত্য, গীত ও বাদ্য। এখানে নৃত্যের প্রাধান্য গীত গৌণ। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে থাকে ঢোল, ধামসা ও সানাই। ঢোল ও সানাই বাজোয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদ্য করে। ধমসা বাজোয়ারা উপবেশন করে ধমসা বাজায়, সে সাধারণতঃ দর্শকের আড়ালে থাকে। মোট চার থেকে পাঁচ জন বাজোয়া থাকে। ঝুমুরিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা আসরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আনাগোনা করে ঝুমুর হাঁকে। নাচোয়ার মুখে থাকে মুখোশ আঁটা, বুকে ঝুলে ঝলমলে রাজকীয় পোষাক, পায়ে বাঁধা ঘুঁঘুর বা নূপুর। বাদ্যের তালে তালে নাচোয়া বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কুঞ্চন প্রসারণ ও কম্পনের মধ্য দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। পালা করে নৃত্যগীত হয়ে থাকে। পালার বিষয় বস্তু সাধারণতঃ রামায়ন মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রক্ষিপ্ত অংশ। সারারাত ধরে ছৌ নাচের আসর বসে। অবশেষে রাত্রি গড়িয়ে ভোর, মা, বোনেরা বাড়ি ফিরে মাড়ুলি দিতে।

জাগরণের পরের দিনটিকে "ভগতাঘুরা" বলে। ভগতারা নিজের পিঠের চামড়া ফুটো করে তাতে সূতা ঢুকিয়ে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করে। ব্রতীরা পুকুর থেকে মন্ডপ অবধি দন্ডী দেয় তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য। তেল হলদার দিনে চড়ক পূজার পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে আর্যবাদের মহাদেব শিবের আগমনে কৃষি সভ্যতার সৃষ্টি চড়ক পূজার আচার, আচরণ উপকরণ সকলি বিলুপ্তের পথে।

৩) রহিন উৎসব বা পরব: এই উৎসবটি জৈষ্ঠ্য মাসের তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে পৃথিবীর বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে। সেইজন্য এই সময় ধান বীজ বপনের সময়। কেননা ধানবীজ সহজেই রৌদ্রের তাপে ও মৌসুমি বায়ুর আর্দ্রতায় অঙ্কুরিত হয়। সেইজন্য কুড়মি সম্প্রদায় চড়কে সংরক্ষিত ধানবীজগুলি গরু বা কাড়ার লাঙ্গলে কর্ষিত জমিতে

ধানবীজগুলি বুনে বা বপন করে। রোগের প্রতিষেধক রহিন ফল সকলে ভক্ষন করে। সন্ধ্যাবেলা কৃষক বধূ ভিজা কাপড়ে নূতন ঝুড়িতে ধানী জমি থেকে কৃষিদেবতা লাঙ্গল চষা শক্ত ঢেলা ঘরে আনে এবং ঘরের চার কোণে এবং তুলসী মন্ডপে রেখে দেয় বা থাপন কের। সেই সময় কৃষক বধূর কথা বলতে ও হাসতে মানা। তাকে মৌন থাকতে হয়। কৃষক ছেলেরা তার মৌন ভাঙ্গার জন্য বাঘ, ভালুক সেজে কাপ করে।

৪) অম্বুবাচী: আষাঢ় মাসের সাত তারিখে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। অনেক জায়গাতে আষাঢ় মাসের যেকোন তারিখে হতে পারে। কুড়মি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই দিনটিতে বসুন্ধরা ঋতুমতি হয় অর্থাৎ ধানীজমি ঋতুমতি হয়ে পড়ে। সেইজন্য তারা এই দিনটিতে কৃষি কর্ম থেকে বিরত থাকে। বসুন্ধরা ঋতুমতি অর্থাৎ সৃষ্টির আদি পর্ব শুরু হয়েছে। রহিনে রোপিত ধানবীজ অঙ্কুরিত হয়ে ছোট ছোট চারা গাছে খেত ভরে গেছে। কৃষকের মনে আনন্দ ধরে না।



৫) জমি তৈরীকরণ: জমি তৈরীকরণ প্রক্রিয়াটি আষাঢ়ের শেষ ও শ্রাবনের প্রারম্ভে হয়ে থাকে। জৈষ্ঠ্যে সৃষ্ট ও আষাঢ়ে বাড়ন্ত চারাগাছগুলির রোপন অবশ্যই প্রয়োজন। সেইজন্য শ্রাবনে জমি তৈরীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। সাধারণতঃ জলাজমিতে কাড়া বা গরুর লাঙ্গলে একবার জমি কর্ষণ করা হয়, তাকে "উগাল করা" বলা হয়। কিছুদিন পরে দ্বিতীয়বার ঐ জমি কর্ষন করলে তাকে "সামাল" বলা হয়। কিছু দিন পরে আবার ঐ জমি কর্ষণ করলে তাকে ঝাভড় বলা হয়। চতুর্থ বার কর্ষণ করাকে কাদা করা বলে। হালোয়া ও গরু কাড়া কাদা মেখে কাদাতে চারাগাছে রোপন করাকে বলা হয় ধান লাগা।



৬) করম উৎসব বা জাওয়া পরব: ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশ তিথিতে এই উৎসবটি হয়ে থাকে। আলো আঁধারি সন্ধ্যায় রাস্তার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে কুড়মি সম্প্রদায়ের বিবাহ যোগ্যা কন্যারা হাত ধরাধরি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে

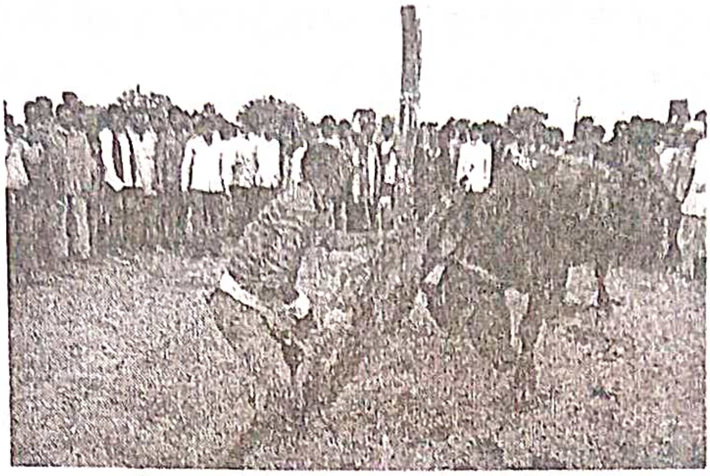
বাম নেগাচারে বৃত্তাকারে নৃত্য করে। এই নৃত্যটিকে করম নৃত্য বলে। নৃত্যের প্রধান অঙ্গ গীত ও নৃত্য। বাদ্যযন্ত্র থাকে না। এমনকি দর্শকও থাকে না। তারা নিজেরাই নাচে ও নিজেরাই দেখে। একাদশী তিথির মোটামুটি দশ থেকে বারো দিন পূর্বে উক্ত কন্যারা সকালবেলা ভিজা কাপড়ে বাঁশের তৈরী টুপা ডালাতে কানাই কানাই বালি ভর্ত্তি করে। টুপা ও ডালাতে তারা জুনার, মুগ ও অড়হর বীজ বুনে। এই পদ্ধতিকে জাওয়াপাতা বলে। প্রত্যহ তারা সকালবেলা ঐ বীজগুলিতে হলুদ জল দেয়। টুপা, ডালার বীজগুলো অঙ্কুরিত হয় ও ছোট ছোট চারাগাছে পরিণত হয়। বীজগুলির অঙ্কুর ও বৃদ্ধি তারা দেখতে পেল অর্থাৎ সৃষ্টির কৌশলটি জাওয়া পাতাতে তারা জানতে পারল। একাদশ তিথিতে প্রত্যুষে মেয়েরা বনজঙ্গলে যায় ফুল তুলতে। কচি হাতে তারা আঁচলে ফুল ভরে। সাঁঝ বেলা তারা রাস্তার মধ্যে প্রোথিত শাল ডালকে আঁজলা ভরে ফুল অর্পন করে। করম ব্রতীরা ঐ শাল ডালকে মনেপ্রাণে স্বামী রূপে বরণ করে। পর দিবস সকালে টুপা ডালার চারাগাছগুলিকে উপড়ে তুলসী মন্ডপে ও খড়ের চালে ছিটিয়ে দেয় এবং পুকুরে স্নান ক্রিয়া সেরে নেয়। এই ক্রিয়াকে পান্নাহার বলে। জাওয়া পাতা ক্রিয়াতে তারা জেনেছিল ধানবীজের অঙ্কুর হওয়া ও বৃদ্ধি। তাছাড়া ঠাকুর মা ও দিদিমার কাছ থেকে জেনেছিল সৃষ্টির রহস্য। এই ক্রিয়াগুলো তারা জেনেশুনে মাতৃত্ব লাভের কৌশল বলে ভালভাবে উপলব্ধি করে। ঋতুমতি হওয়া ভ্রূণের উৎপত্তি, ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ শিশু জন্মগ্রহণ ঐ কৌশলগুলো তারা জেনে ফেলে। ধানীজমির কিশোর প্রাপ্ত চারাগাছগুলিকে তারা গানে ও নৃত্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চায় যেন চারাগাছগুলি ধানশিস উৎপাদন করে এবং উহাতে সুস্পষ্ট দানাদার ধান শস্য বিদ্যমান থাকে।

৭) জিতা উৎসব বা পরব: ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টম তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই উৎসবে কেবলমাত্র বিবাহিত মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে। এই মহিলাগণ একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর সৃষ্টির রহস্যগুলো জেনে থাকে। ঋতুমতি হওয়া, ভ্রূণের উৎপত্তি বিকাশ ও প্রসবের মাধ্যমে মানব শিশুর জন্ম এই রহস্য বা কৌশলগুলো তাদের জানা থাকে। সেইজন্য এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা বিবাহিত মহিলা হয়ে থাকে। কুড়মি সম্প্রদায়ের বিবাহিত মহিলার তাদের আরাধ্য দেবতা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করে যেন রহিনে রোপিত বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে যে চারাগাছ সৃষ্টি ও যৌবন প্রাপ্তি হয়েছে সেইগুলি যেন শীষ ভর্ত্তি সুস্পষ্ট বলবান ধান শস্যদানা সৃষ্টি করে। ধান শস্য দানা যেন আগড়া ও খেঁকরি না হয়। সূর্যের

অবশ্যই জানা সকলের প্রয়োজন।

বৈদিক যুগের আর্য-অনার্য সংঘর্ষে কুড়মি সম্প্রদায় আর্যদের কাছে পরাজিত

১০) বাঁদনা উৎসব: কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বাঁদনা উৎসবের বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে। যথাক্রমে বাঁদনা উৎসব, গো বন্দনা ও বুড়ি বাঁদনা নামে অভিহিত। এই উৎসবের উৎপত্তি বা সৃষ্টি



উপাসনাতে ইক্ষু গাছের প্রয়োজন হয়। ইক্ষু গাছের অর্থ হল ধান শীষের ধানে চাল যে পরিপূর্ণতা লাভ করে ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধানের চাল যেন গোটা ও ইক্ষুর রসের মত মিষ্টি যুক্ত হয়। জিতা উৎসব কৃষি সভ্যতা থেকে উৎপত্তি ও কুড়মি সম্প্রদায়ের অনার্য পরব। কিন্তু বর্তমানে আর্যসভ্যতা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জীমূত বাহনের আগমনে জিতা উৎসব জিতা অষ্টমীতে পরিণত।

৮) ধান জাগানো অনুষ্ঠান: ধান জাগানো অনুষ্ঠানটি সাধারণতঃ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্ঠম তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধানী জমির ধান গাছগুলির থোড় অবস্থা এসেছে। থোড় অবস্থাটি ধানগাছেরর গর্ভাধান বোঝায়। গর্ভাধানে সাধভক্ষনের প্রয়োজন হয়। তাই কুড়মি সম্প্রদায়ের সদস্যগন চালের গুঁড়ি জলের সাথে মিশিয়ে থোড়ালো ধানগাছের উপর ছিঁটিয়ে দেয়। এই ক্রিয়াটিকে ধানগাছের সাধভক্ষন বলা হয়। আবার অনেকে ধান জাগানোও বলে থাকে।

৯) খামার নির্মান উৎসব: আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়ে থাকে। ধান জমিতে কাঁচা পাকা ধানে ধান শিস ভর্ত্তি থাকে। উহা ধানীজমি থেকে গৃহে আনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সংরক্ষণের জন্য খামার তৈরী করা হয়। গরু বা কাড়ার লাঙ্গলে গৃহ সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে চাষ বা কর্ষণ করে উৎপন্ন মাটির ঢেলা গুলিকে জলে ভিজিয়ে কৃষক বধূ ডান হাত দিয়ে সমতল করে। এই পদ্ধতিটিকে খামার পল্যা বলা হয়। এরপর পুরুষ সদস্য স্নান সেরে ভিজা কাপড়ে খামারের চারকোণে চারটি ভেলা গাছের ডাল পুঁতে দেয় এবং খামারের মাঝখান জল ভর্ত্তি ও একটি ভেলা ডাল সমেত একটি মাটির ভাঁড় স্থাপন করে। কুড়মিদের বিশ্বাস ঐ জলের ভাঁড়ের কৃষি দেবতা অবস্থান করে। ভেলা ডালগুলো কুদৃষ্টি থেকে কৃষি দেবতাকে রক্ষা করে।

ও বিতাড়িত হয়ে বনজঙ্গলে বাস করার জন্য এই কুড়মি সম্প্রদায়কে জঙ্গলের কুড়মি, ঝারি কুরমি ও টোটেমিক কুড়মি বলা হয়। টোটেমিক কুড়মি জাতির আদিদেবতা হল বুড়হাবাবা। বনে জঙ্গলে বাস করার জন্য কুড়মিদের প্রচুর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাদের জীবনধারণের মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। কুড়মিদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অভাব, অনটন দুর্দশা দেখে বুড়হা বাবা খুব ব্যতিত হয়। তাই বুড়হাবাবা তাদের অভাব অনটন সমাধানের জন্য কৃষিকার্যের কথা চিন্তা করে। কৃষিকার্য থেকে উৎপাদিত শস্য তাদের উদর পূরণের বিশেষ সহায়ক হবে।

তাই বুড়হা বাবা কৃষিকার্যের জন্য তার বাহন বাসু বলদ ও দুটো সহোদর ভাই ও মাতা কপিলা গাইকে লাঙ্গল টানার জন্য কুড়মিদের নিকট প্রেরণ করে। তার ফলে অল্প সময়ে বেশী জমি কর্ষিত হয় ও ফসল বেশী উৎপন্ন হয়। ক্রমান্বয়ে কুড়মিরা অধিক কাজের ও বেশী ফলনের জন্য কোপিলা গোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। বাসু বলদ গোষ্ঠী কুড়মিদের নিকট থেকে পর্যাপ্ত পরিষেবা ও সেবা যত্ন না পেয়ে লাঙ্গল টানার সময় ভূল আঁতর কাটে। তার ফলে কুড়মিরা রেগে তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে এবং পইনা দিয়ে পিঠে পেটাতে শুরু করে। তার ফলে বাসু বলদ গোষ্ঠীর পিঠে ঘা হয়। এই করুণ দুর্দশার ঘটনা তারা বুড়হা বাবার কাছে নালিশ করে। বুড়হাবাবা বেশ ফাঁপরে পড়ল। বুড়হা বাবা সঠিক সিদ্ধান্ত নিলেন কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা রাত্রিতে স্বয়ং কৃষক বাড়িতে উপস্থিত থেকে কুড়মি সম্প্রদায়ের ও বাসু বলদ গোষ্ঠীর অভিযোগ শুনবে। দোষী সাব্যস্ত পক্ষকে শাস্তি প্রদান করবে। বুড়হা বাবার এই আদেশ প্রচার ও চাউর হতে কুড়মি সম্প্রদায় তাঁদের মত পরিবর্তন করল। গবাদি পশুকে অত্যাচারের পরিবর্তে সেবা শুশ্রুষা ও পরিচর্যায় তারা মন দিল। কুড়মিদের উদ্দেশ্যে বুড়হা বাবার কুড়মি ঘরে আগমন উপলক্ষে যে উৎসবের সূচনা হয়, সেই উৎসবকে গো বন্দনা, বা বাঁদনা বা বুড়ি বাঁদনা বলা হয়।

এই উৎসবের চারটি অংশ যথাক্রমে-ঘাওয়া, অমাবস্যা, প্রতিপদ ও দ্বিতীয়া। ঘাওয়ার রাত্রিতে কুড়মি আচার অনুষ্ঠান মেনে কুড়মি পুরুষ সদস্য গোয়াল ঘরের গবাদি পশুর সিংয়ে তেল মাখার পর আঙ্গুল দিয়ে কয়েকটি গোলাকৃতি সিঁদুরের রেখা টানা হয় এবং উৎসবের সূচনা করা হয়। গবাদি পশুর অভাবে খাম খুঁটায় তেল সিঁদুর দেওয়া হয়। পর দিবস অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশের উৎসবে অমাবস্যা রাত্রিতে গোয়াল ঘরে সারারাত জ্বলতে থাকে ঘিয়ের প্রদীপ। একে জাগর জ্বালা বলা হয়। বাড়ীর পুরুষ সদস্য গবাদি পশুর শিঙে তেল ও সিঁদুরের দাগ টেনে দেয়। গবাদি

পশুর মাথায় ঝুলতে থাকে কাঁচা পাকা ধানের মোড়। বাড়ীর মহিলা সদস্য লাল পেড়ে শাড়ী পরে মুখভর্ত্তি পান নিয়ে, দুটো হাতে বাঁশ নির্মিত কুলা নিয়ে গোয়াল ঘরে প্রবেশ করে। গবাদি পশুর টঁগে থাকে আগড়ী ও খেঁকরি ধানের গাছ ও ঘাসের বোঝা। অমাবস্যার বিকেলবেলা স্ত্রী সদস্য প্যানা লতা বা রামঝিঙ্গার নির্যাস গুঁড়ির সাথে জল দিয়ে মিশিয়ে লার তৈরী করে। ডান পাঁচটি আঙ্গুল দিয়ে ঐগুলো গৃহের আঙ্গিনার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চোক পুরে অর্থাৎ আলপনা দেয়। তার উপর মড্ডা ঘাসগুলিকে বাছুর ছানা ডিঙ্গিয়ে দেয়। মৃন্ময় বাড়ীর দেওয়ালগুলিতে নূতন মাটি লেপন ও তার উপর গিরি মাটি, খড়ি মাটির রঙ দিয়ে আকর্ষনীয় করা হয়। আঙ্গিনার ও তার আশেপাশের খাল, ডোবা, নূতন মাটি দিয়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভরাট করা হয়।

কুড়মি সম্প্রদায়ের উটতি বয়সের ছেলে ছোকরা ঝাঁগড় দল বানায়। সংখ্যায় তারা দশ থেকে বারো জনের মতো থাকে। অমাবস্যা রজনীতে তারা ঘরে ঘরে অহিরা গীত গেয়ে গবাদি পশু জাগায়। অহিরা গীতের তিনটি অঙ্গ, যথাক্রমে- গীত, নৃত্য ও বাদ্য। বাদ্যযন্ত্রগুলি হয় ঢোল, ধামসা, মাদল ও সানাই। গীতের বিষয়বস্তু হল কপিলা গাই, বাসুবলদ, সহোদর দুই ভ্রাতা ও কৃষিজ বস্তুর কিছু উপাখ্যান। নৃত্যের মধ্যে দেহের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গি। তারা ঘরে ঘরে ঝাঁগড় খেলে গরু জাগায়।

উৎসবের তৃতীয় অংশ হল প্রতিপদ বা গরয়া ঠাকুর আরাধনা। উপোসী গৃহবধূ বিকেলবেলা তুলসী মন্ডপে নূতন চুলোতে নূতন ছোট ছোট গুঁড়ি ও ঘিয়ের পিঠা বানায়। পুরুষ সদস্য তুলসী মন্ডপে বুড়হা বাবাকে ঘিয়ের ছাঁকা পিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করে। কুড়মি সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস গীত বাজনা বুড়হা বাবাকে সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন ও গবাদি পশুর সেবা শুশ্রুষা স্বাস্থ্যবান করাতে বুড়হা বাবা খুশি হবে ও নিজেরা নির্দোষ বলে প্রমানিত হবে।

পরদিবস অর্থাৎ উৎসবের শেষ অংশ হল দ্বিতীয়া বা নাচন পর্ব। গ্রাম সংলগ্ন মাঠে বা রাস্তার মাঝে শক্ত, মোটা, খুঁটি থাকে উহাতে, ঢিলে ঢালা দড়ি থাকে। ঐ দড়িতে স্বাস্থ্যবান পুরুষ গরু বা কাড়াকে ঐ দড়িতে বেঁধে ডানদিক থেকে বাম দিকে বৃত্তাকারে নাচানো হয়। নির্বাচিত শক্তিমান পুরুষ কাড়া বা গরুটিকে শিঙে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে, কপালে মোড় ঝুলিয়ে, গায়ে নানা প্রকার ছোপ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়। তারপর ঐ খুঁটির দড়িতে পশুটিকে বাঁধা হয়। ঝাঁগড় দল গান বাদ্য ও নৃত্য করে এগিয়ে আসে ঐ খুঁটির নিকটে। ঝাঁগড়দের একজন বাঁধা পশুটির

মাথার কাছে মরা গরু বা কাড়ার শুকনো চামড়া ঠেকিয়ে রাখে। পশুটি উত্তেজনা বা ভয় বশতঃ চামড়ায় শিঙ দিয়ে ঢুঁশ মারে। বরাবর ঢুঁশ মারতেই থাকে। অবশেষে খেলোয়াড় পশুটি ক্লান্ত হলে ঝাঁগড় দলটি এগিয়ে যায় অন্য খেলোয়াড় পশুর কাছে, পিছনে অনুসরণ করে দর্শকমন্ডলী। অবশেষে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে, সকলে বাড়ী ফিরে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাতে।

বুড়ি বাঁদনা বাদ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে গুঁড়ি বাঁদনার প্রচলন আছে। বুড়ি বাঁদনার পরের দিনে গুঁড়ি বাঁদনা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গুঁড়ি বাঁদনাতে বন্ধ্যা স্ত্রী জাতির গবাদি পশুকে খুঁটিতে বেঁধে নাচানো হয় ও আনন্দ উপভোগ করা হয়। কুড়মি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বাঁঝা গাভী বা মোষ নাচানোর ফলে তাদের জরায়ু পরিষ্কার হয় ও সন্তান ধারণে সক্ষম হয় এবং বংশবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। আদিম যুগে কুড়মি সংস্কৃতি বা কালচার সৃষ্টি হলেও আজও তার ম্লান হয়নি। সেই ট্রেডিশান সমানে চলেছে, কোথাও পরিবর্তন হয়নি।

* **বেনী আনা উৎসব :** অগ্রহায়ন সংক্রান্তিতে ধান কাটা শেষ হলে কুড়মি জাতি জমি থেকে তিনটি বা পাঁচটি শিষ্‌ওয়ালা ধান গাছ একত্রে আঁটি বেঁধে খামারের সন্নিকট গাছের উপর বা ধান পালুই এর উপর রেখে দেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে ঠাকুর আনা বা বেনী আনা উৎসব বলে। আঁটি বাঁধা তিনটি বা পাঁচটি ধান গাছ হল কৃষি দেবতা। বেনী আনার অর্থ হল কৃষি দেবতাকে জমি থেকে গৃহে আনয়ন করা।

* **টুসু থাপন উৎসব :** অগ্রহায়ন সংক্রান্তিতে কুড়মি সমাজের অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা টুসু থাপন উৎসব সূচনা করে। তারা বাঁশ নির্মিত ঝুড়িতে বকনা বাছুরের গোবর চালের গুঁড়ি, শালগাছের ফুল ও দুর্বাঘাষ দিয়ে ভর্ত্তি করে। ঝুড়ির উপরে পুষ্ট পাকা ধান বুনে। এরপর মাটির সরা ঝুড়িটির মুখ ঢেকে দেয়। প্রত্যহ আলো আঁধারী সন্ধ্যায় তার ঝুড়ির ঢাকনা খুলে ও দেখে বুনা ধানগুলো অঙ্কুরিত হয়েছে কিনা। তারপর তারা সমস্বরে টুসু গান গায় ও নৃত্য করে। তাদের আসরে কোন বাদ্যযন্ত্রও থাকে না, আলোর ব্যবস্থাও নেই। কোন দর্শক ও থাকেনা, তারা নিজেরাই নাচে, নিজেরাই দেখে। নাচতে নাচতে তারা একদিন ঝুড়ির ঢাক্‌না খুলে দেখতে পায় বোনা ধানে অঙ্কুর ধরেছে। অর্থাৎ ধানশস্য ঋতুমতি হয়েছে। কুমারী মেয়েরা উপলব্ধি করে ধানশস্য যৌবন সম্ভবা, সৃষ্টির জন্য স্বামী মিলনের অবশ্যই প্রয়োজন। জেনে গেল তারা সৃষ্টির গোপন রহস্য।

* **পৌষ সংক্রান্তি :** পৌষ মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় পৌষ সংক্রান্তি বা মকর

সংক্রান্তি। কুড়মি শাস্ত্রে বলে এই দিনটিতে সূর্যের দক্ষিণ পথ পরিক্রমা শেষ হয় এবং উত্তর পথ পরিক্রমা আরম্ভ হয়। কুড়মিদের বিশ্বাস সূর্যের দক্ষিণ পথ পরিক্রমাকালে ধানবীজে আঁকুর ধরে না, কিন্তু উত্তর পথ পরিক্রমাকালে ধান বীজে আঁকুর হয়। মকর সংক্রান্তির পর দিবস সূর্য উত্তর পথে নড়তে শুরু করে এবং কৃষিকার্যের সূচনা হয়ে থাকে।

মকর সংক্রান্তির তিন দিন পূর্বে ধান বীজের আঁকুর হওয়ার ধাপ বা পদ্ধতিগুলি শুরু হয়ে থাকে। টুসু থাপন উৎসবে কুমারী মেয়েরা দেখতে পেল বাঁশের ঝুড়িটিতে বোনা ধানবীজে অঙ্কুরিত হয়েছে, অর্থাৎ ঋতুমতি হয়েছে। সৃষ্টির আদিপর্ব শুরু হয়েছে। এই দিনটিকে কুড়মি সম্প্রদায় আঁউড়ি বলে অভিহিত করে। আঁউড়ি ধানবীজের আঁকুর হওয়ার প্রথম দিন। ধানের আঁকর হওয়ার দ্বিতীয় দিনটিকে চাঁউড়ি ও তৃতীয় দিনকে বাঁউড়ি ও ঋতুর শেষ দিন বা আঁকুর হওয়ার শেষ দিনটিকে মকর বলা হয়। এই চারটি দিনে ধানের সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। গর্ভবতী মহিলার পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। ধান বীজের প্রতীক স্বরূপ কুড়মি সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যেমন পিঠা, গুড়-চিড়া, মুড়ি উপাদেয় খাবারগুলো এই চার দিনে আনন্দ সহকারে খেয়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার নূতন পোষাক ব্যবহার করে। কুড়মি সম্প্রদায় পাকা, পুষ্ট ধান বীজকে, মাটি নির্মিত বালিকা মূর্তিটিকে টুসু বলে কল্পনা করে।

মকর সংক্রান্তিতে ঋতুমতি অর্থাৎ অঙ্কুরিত ধান বীজটিকে অর্থাৎ মাটি নির্মিত প্রতীকী টুসুটিকে কোন জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। কুড়মি সম্প্রদায় মনে করে প্রকৃত জাত ধানবীজের শ্বশুর বাড়ী কোন জলাশয় বা জলাশয় ধান বীজের স্বামী। আগামী মরশুমে ধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ধান বীজের স্বামী মিলন বা জলাশয়ে অবস্থান বিশেষ প্রয়োজন। তারা ব্যবহারিক জীবনে জেনে ছিল সৃষ্টির জন্য স্বামী মিলন অবশ্যই প্রয়োজন। তাই কৃষি সম্প্রদায় আপন কন্যাসম ধানের প্রতীকি সাধের টুসুটিকে চৌড়ল যানে চড়িয়ে সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রাখার জন্য গ্রামের সন্নিকট কোন জলাশয়ে বিসর্জন দেয়।

টুসু উৎসব বর্তমানে জাতীয় উৎসব ও সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। ইহা মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক উৎসব এবং কুড়মি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি উৎসব ইহা কোন সন্দেহ নেই। ইহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু বর্তমানে এই উৎসবের পরিকাঠামো বিভিন্ন সংস্কৃতির আগমনে ইহা নষ্ট হতে চলেছে। টুসু উৎসবের এই অবক্ষয় কুড়মি

সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ও বেদনাদায়ক।

কুড়মি জাতির অংশীদারী বা ভাগিদারী উৎসব:

বসতি গড়ার সাথে সাথে জীবনের পরিপূরক সংস্কৃতিও গড়ে উঠে। কুড়মিদের বারমাসে তেরো পার্বন নিছক কৃষি কৃষ্টির ফসল। জীবন ধারা অব্যাহত রাখার উৎসব। কুড়মি জাতির বসতি গড়ার সাথে সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর বাসস্থানও গড়ে উঠে। ফলে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনে বিভিন্ন সংস্কৃতির আদানপ্রদাও বিনিময় ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠে। তার মধ্যে ভাদু উৎসব একটি।

ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের উৎসব। বর্তমানে এই উৎসব সার্বজনীন রূপ নিতে চলেছে। রাঢ় অঞ্চলের O.B.C. সম্প্রদায়ভূক্ত বিভিন্ন জাতির সকল শ্রেণীর মহিলাগণ ভাদু উৎসবে অংশগ্রহন করে থাকে। সারা ভাদ্র মাস রাত্রিবেলা উক্ত মহিলাগণ একত্রিত হয়ে সমস্বরে ভাদু মন্ডপে ভাদু গান গায় ও নৃত্য করে।

খড় কুটো, কাঠ দিয়ে তার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে কুমারি মেয়ের আদলে ভাদুর প্রতিমা গড়া হয়। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের দিনটিকে জাগরণ বলা হয়। জাগরণ রাত্রিতে সারারাত ধরে চলে ভাদু গানের আসর। পরের দিন পান্নাহারে ভাদুটিকে যেকোন জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। এরপর ভাদুর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের সকলের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ভাদুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন জনশ্রুতি রয়েছে। সেগুলো পর পর বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহে তৎকালীন পঞ্চকোট বা পাঁচেটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও অংশগ্রহন করেন। তাঁর সময়কাল থেকে ভাদুর উপাখ্যান আমরা জেনে থাকি। ভাদু উৎসবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা নীলমণি সিংহদেও।

রাঢ় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি উঁচু নিচু কাঁকুরে যুক্ত। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ঐ অঞ্চলে তৎসময় আউস ধানের প্রচলন ছিল এবং ভাদ্র মাসে আউস ধান পাকত। এই কৃষিকাজে মহিলারা অংশগ্রহন করত। কৃষিকাজের কষ্ট লাঘব করার জন্য মহিলারা সকলে একত্রে সমস্বরে ছোট খাটো জীবনের সুখ দুঃখ প্রেম, ভালবাসা প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাগুলোকে উপজীব্য করে গান গেয়ে গেয়ে নৃত্য করত। অনেকে মনে করেন এই গান থেকে ভাদু উৎসবের উদ্ভব হয়েছে। রাজা নীলমণি সিংহদেও এই ভাদু গানকে আউস ধানের নবান্ন উৎসব বলে অভিহিত করেন। ভাদু উৎসবের আর একটি জনশ্রুতি উপাখ্যান আছে। ভাদ্র মাসে ছাত্নার রাজার

সাথে নীলমণি সিংহ দেওর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজা নীলমণি সিংহ দেও বিজয়ী হন। তাঁর বিজয় স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য রাজা এই ভাদু উৎসব প্রচলন করেন।

বেশীর ভাগ জন সাধারণ উক্ত ঘটনা সমূহকে টুসুর উৎপত্তি মানতে নারাজ। তাঁরা মনে করেন ভাদুর উৎপত্তি পাঁচেট রাজ্যের রাজ পরিবার থেকে। রাজার কোন কন্যা সন্তান ছিল না। একদা রাজা অরণ্যে শিকারের সময় সদ্য প্রসূত কন্যা সন্তান দেখতে পান। রাজা ঐ কন্যা সন্তানকে বাড়ীতে এনে প্রতিপালন করেন ও নামকরণ করেন ভাদু বা ভদ্রাবতী। যেহেতু সময়টা ছিল ভাদ্র মাস। রাজ পরিবারের লালন পালনে বড় হয়ে উঠে ভাদু। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত, বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠে সে। ভাদুর পাত্রস্থ করা একান্ত প্রয়োজন। বিয়ের রাতে ভাদুর হবু বা ভাবী স্বামী আততায়ীর হাতে নিধন হলে অন্য পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন রাজা। ভদ্রাবতী ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কেননা হবু স্বামী সাথে তার মনে প্রাণে বিয়ে হয়ে গেছে। সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত ভদ্রাবতী আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাজা মনে খুব দুঃখ পেলেন। ভদ্রাবতীর স্মৃতি রক্ষার জন্য রাজা রাজপরিবারে ভাদুর মূর্ত্তি বানিয়ে ভাদুর উৎসব প্রচলন করেন। ক্রমশঃ এই উৎসব রাজ পরিবারের বেড়া পেরিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে সার্বজনীন উৎসবের রুপ নিয়েছে।

নাচনী নাচ:

নাচনী নাচ আমোদ-প্রমোদের নৃত্য। সাধারনত O.B.C. এবং S.C. সম্প্রদায়ভূক্ত উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরারা নাচনী নির্বাচন করে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা পরিবারের উঠতি সুন্দরী যুবতীকে ওরা নাচনী বানায়। সাধারণতঃ গ্রামের আট থেকে দশ জন যুবক নাচনী বানার কাজে উদ্যোগ নেয়। তারা নাচনীর পিতা মাতা বা অভিভাবককে না জানিয়ে নাচনীকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিনের জন্য কোন গোপন ডেরাতে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন পর তারা বাড়ী ফিরলে, ঐ নাচনীর উপর তার পিতা মাতার কোন অধিকার বা দাবী থাকে না। ঐ আট থেকে দশজন ছোক্‌রার মধ্যে একজন অর্ধস্বামী বনে। অর্ধস্বামীকে রসিক বলা হয়। রসিকের স্বীকৃতি স্বরূপ নাচনী হাতে নোয়া ও মাথায় সিঁদুর পরে। নাচনী কখনো কুলবধূ বা গৃহবধূর স্বীকৃতি পায়নি। অবশিষ্ট ছেলে ছোক্‌রারা নাচনীকে দেখাশুনা ও আনন্দ উপভোগ করে। এরপর নাচনীর নৃত্য, গীত তালিম দেওয়া পালা। কোন বিশেষজ্ঞা প্রবীন নাচ্‌নীর সান্নিধ্যে নাচ গানের আদব কায়দা আয়ত্ব করে সে। এরপর তারা

দল বেঁধে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আসর বেঁধে নাচনী নৃত্য প্রদর্শন করে।

নাচনীকে দু ভাগে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে ধুমড়ি নাচনী ও খেমটি নাচনী। কোন গ্রামীন মেলা উপলক্ষ্যে বিকেলবেলা খোলা আকাশের নিচে মাটির উপরে ধুমড়ী নাচের আসর বসে। পুরুষ-মহিলা বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকমন্ডলী বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে নাচনী নৃত্য উপভোগ করে। বৃত্তাকারের মধ্যস্থলে নাচনী বিভিন্ন প্রকার সাজ পোশাকে পরিবৃতা হয়ে কোমর দুলিয়ে হাত নেড়ে আগে পিছে নৃত্য করে। দর্শক মন্ডলীকে আকর্ষণ করার জন্য কোমরে পরা থাকে তিন থেকে চারটি ছোট বড় রঙ্ বেরঙের ঘাঘরা, পায়ে নূপুর, নাকে নোলক, কানে কান পাশা ও হাতে রুমাল। নাচ গানে মুগ্ধ হয়ে দর্শকমন্ডলী নাচনীকে দু এক টাকা ফেরি দেয়। তাতে নাচনীর উৎসাহ বেড়ে যায়।

নাচনী নাচের তিনটি অঙ্গ। যথাক্রমে গীত বা ঝুমুর নৃত্য ও বাদ্য। বাদ্যযন্ত্রগুলি হল ঢোল, ধামসা ও সানাই। নাচনী নাচের আর একটি ভাগ হল খেমটি নাচ। খেমটি নাচ রাত্রিবেলা, আলোর মাধ্যমে সামিয়ানার নিচে সতরঞ্জের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য করে। দর্শকমন্ডলী উপবিষ্ট হয়ে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে আনন্দ উপভোগ করে। খেমটির পোষাকের বাহার থাকে না। খেমটি নাচের তিনটি উপাদান। যথাক্রমে ঝুমুর বা গীত, নৃত্য ও বাদ্য। বাদ্যযন্ত্রগুলো হল- হারমোনিয়াম, ডুবি তাবলা ও ফ্লুট বাঁশি। নাচনী বাদ্যের তালে ঝুমর গানগুলো গেয়ে নৃত্য করে।

সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঝুমুরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ঝুমুরগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যা। প্রাচীন ঝুমুর বা আদি ঝুমুর, মধ্যযুগের ঝুমুর ও আধুনিক যুগের ঝুমুর। আধুনিক যুগের ঝুমুর কবিরা গ্রামের নিরক্ষর রাখালগণ। তারা আপন মনে গুনগুন করে প্রেম ভালবাসার ঘটনাগুলোকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। গানগুলি আদি রসাত্মক। গানগুলি দু এক কলি ভালবাসার গান, মাটির গান। মুদ্রন যন্ত্র না থাকার জন্য গানগুলোর সংরক্ষন বা ছাপা হতো না। বংশ পরম্পরা মুখে মুখে প্রচারিত হত মাত্র। ঝুমুরের ভনিতাতে ঝুমুর কবির নাম থাকে না। মধ্যযুগের ঝুমুরগুলি পয়ার ও ত্রিপদী পদে রচনা হত। মুদ্রন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে গানগুলিকে ছেপে সংরক্ষন করে রাখা হত। গানের ভিনিতাতে রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। ঝুমুরের রস, ভাব ও বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ঝুমুর আস্বাদন করা হত। সাধারনতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, রামায়ন, মহাভারত ও সারাবলীর প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি প্রধান উপাদান ও বিষয়বস্তু। মধ্যযুগের নাচনী নৃত্য ও ঝুমুর পর্বগুলি পল্লবিত হয়ে উঠে স্থানীয় জমিদারদের আনুকূল্যে ও

পৃষ্ঠপোষকতায়। ঝুমুরের মধ্যযুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হয়। স্বর্ণ যুগে বিভিন্ন ঝুমুর রচয়িতাগণ বিভিন্ন স্বাদের ঝুমুর রচনা করে ঝুমুরের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। ভবপ্রীতা ওঝা, নরোত্তম দাস, দ্বিজটিমা প্রভৃতি ব্যক্তি মধ্যযুগের ঝুমুর কবি।

স্বাধীন ভারতে ইংরেজ সৃষ্ট জমিদারদের ক্ষয়িষ্ণু রুপ প্রকাশ পায়। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঝুমুর শিল্পে ভাটা পড়ে। সরকার সৃষ্ট স্বাস্থ্য সচেতনা, পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা সম্প্রসারন ইত্যাদিগুলো আধুনিক ঝুমুরের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগে কবিরা হলেন ৺শলাবত মাহাত, সুনীল মাহাত ও ৺ললিত কিশোর মাহাত প্রমুখ মহোদয় বৃন্দ। নাচনী নাচের প্রাণ স্পন্দন হল ঝুমুর। এই ঝুমুরকে লালন পালন ও স্বাবলম্বী করে তুলে নাচনী। এক সময় নাচনীর ভরখরি যৌবন গড়িয়ে বার্দ্ধক্য আসে। যৌবনে ভাটা পড়াতে তার কদর কমে যায় বা থাকে না। রসিক তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সহযোগী ছোক্‌রাবৃন্দ পঁয়তারা সহায় সম্বলহীন নাচনীর আপন বলতে কিছু থাকেনা, শুধু পড়ে থাকে মলাট বন্দী ঝুমুর।

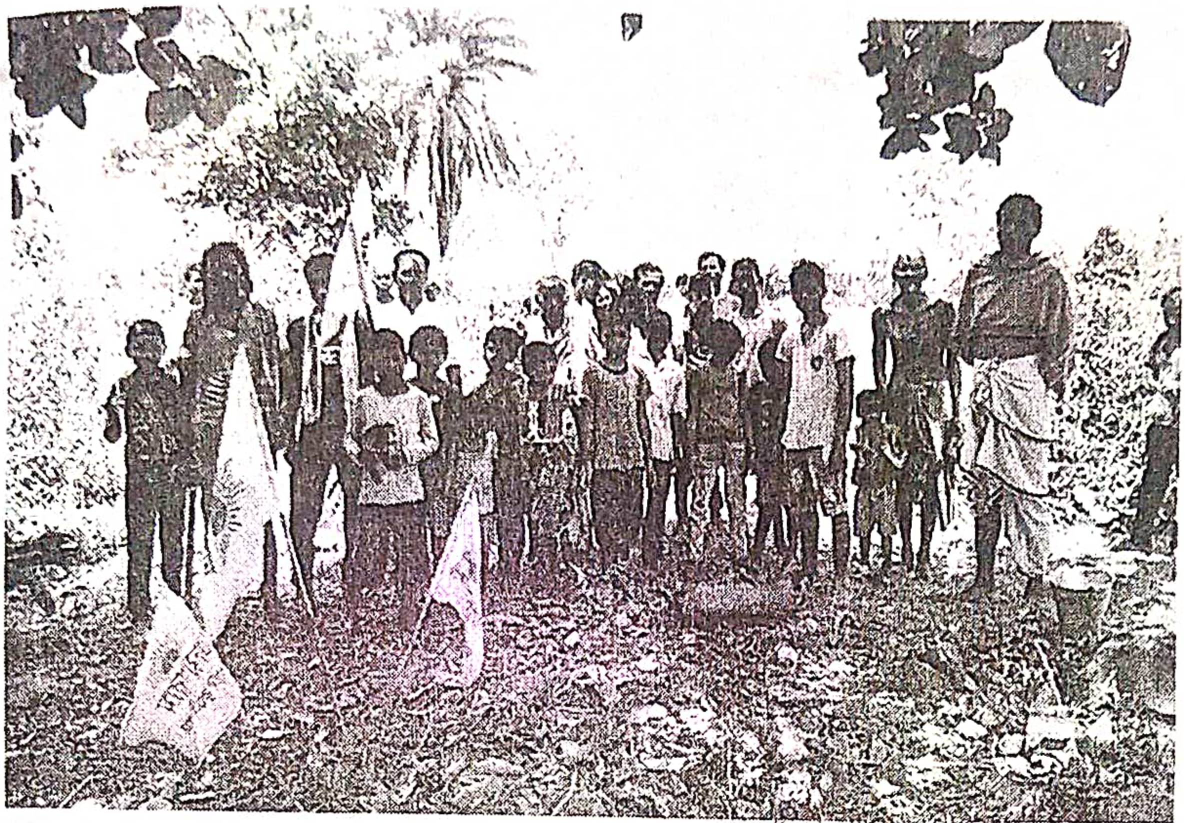
একনজরে কুড়মি জাতির সংস্কৃতি:

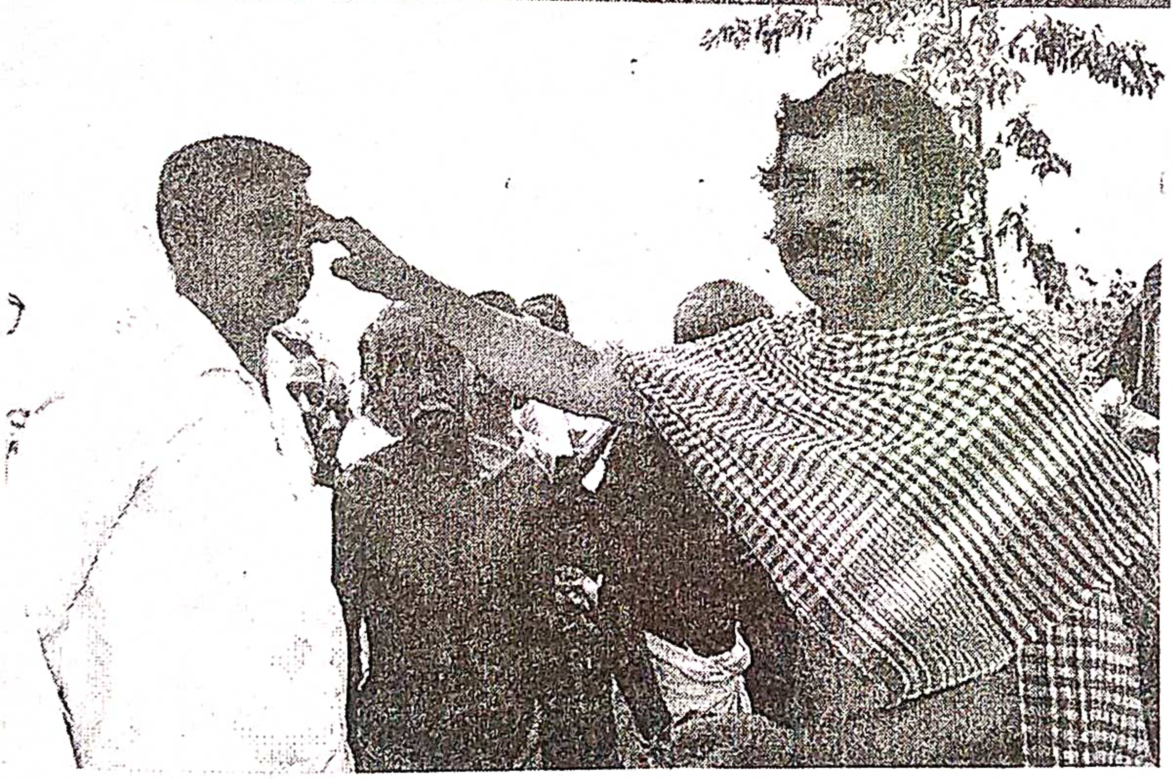
কৃষির উৎস থেকে কুড়মি জাতির উৎসবগুলির সৃষ্টি। তাই উৎসবগুলি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। পয়লা মাঘ গরাম ঠাকুরকে স্মরণ করে জমিতে আড়াই পাক লাঙল চষে কৃষিকাজের সূচনা করা হয়। চৈত্রের চড়ক পূজাতে অঙ্কুর হওয়ার সম্ভাবনা ধানশস্যকে আলাদা করে রোহিন উৎসবে বপন করার জন্য সংরক্ষন করা হয়। ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ সূর্যদেবের উত্তরায়নে চড়কপূজাতে আলাদা করা বীজগুলিকে জমিতে লাঙল চষে বপন করা হয়। আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে অম্বুবাচী উৎসবে ধরিত্রী ঋতুমতী হয়ে উঠে। আষাঢ়ের শেষে ও শ্রাবনের প্রারম্ভে ধান চারা গাছগুলি রোপনের জন্য জলাভূমিতে কয়েকবার লাঙল চষে মাটি তৈরী করা হয় ও ধান চারাগুলি রোপন করা হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে একাদশ তিথিতে কুমারী কন্যাগণ করম গানের মাধ্যমে ম্যাচুর ধান চারাগাছগুলিকে যৌনক্রিয়াগুলি শিখিয়ে দেয়। তারা জানে যৌনক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই তারা ধান চারা গাছগুলি কে ধান শিষের উৎপাদন ক্রিয়াটি গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে সধবা ও বিধবা রমনীবৃন্দ শস্যদেবতা সূর্যের নিকট প্রার্থনা করে যেন উৎপাদিত ধান শিষে ধানবীজগুলো পুষ্ট ও সুস্বাদু হয়ে থাকে।

ধান শিষের ধান বীজগুলি যেন আগড়া ও খেঁকরি না হয়। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টম তিথিতে থোড়ালো ধান চারাগাছগুলিকে চালের গুঁড়ি ছিটিয়ে সাধভক্ষন করানো হয়। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে কৃষি জমিতে কাঁচা পাকা ধানগুলো বাড়িতে সংরক্ষণের জন্য খামার তৈরী করা হয়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বুড়হা বাবা প্রেরিত গবাদি পশুর যত্ন নেওয়া এবং পশুদের তেল সিঁদুর মাখিয়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বুড়হাবাবার অভ্যর্থনার জন্য গরয়া পিঠা বানানো হয়। অগ্রহায়ন সংক্রান্তিতে তিন থেকে পাঁচটি শিষওয়ালা ধান গাছ একত্রে বেঁধে মাথায় করে খামারে আনা হয় এবং সকালবেলা ছড়া বা মাড়ুলি এবং সাঁঝবেলা প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেইদিন টুসু থাপন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিতে টুসুকে চৌড়ল যানে চড়িয়ে জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় অর্থাৎ পুষ্ট ধানটিকে অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য জলাশয়ে নিমজ্জিত করা হয়। বীজ অঙ্কুর হওয়ার জন্য আলো, তাপ ও জলের অবশ্যই প্রয়োজন। এই হল কুড়মি উৎসবের সাতকাহন।

।। সমাপ্ত ।।



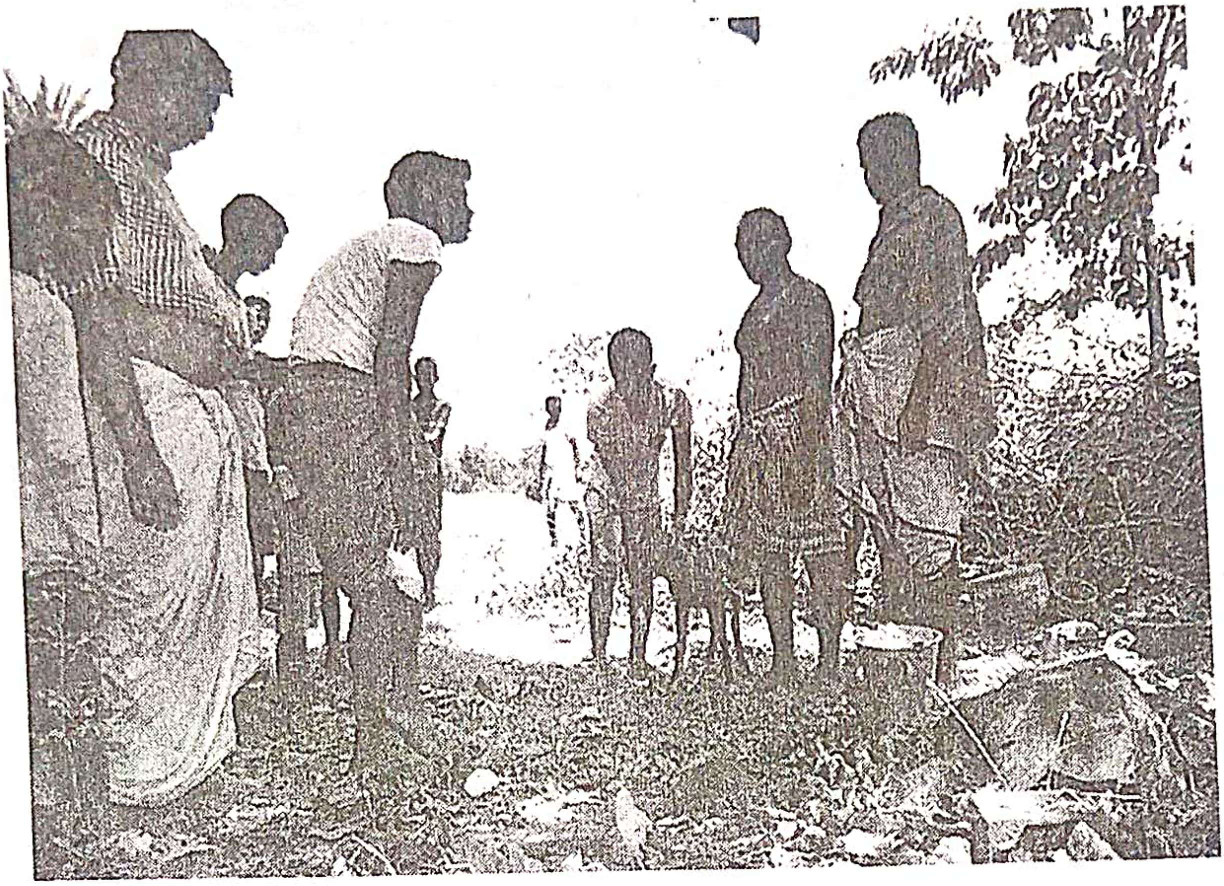


—ঃ তথ্যসূত্র ঃ—

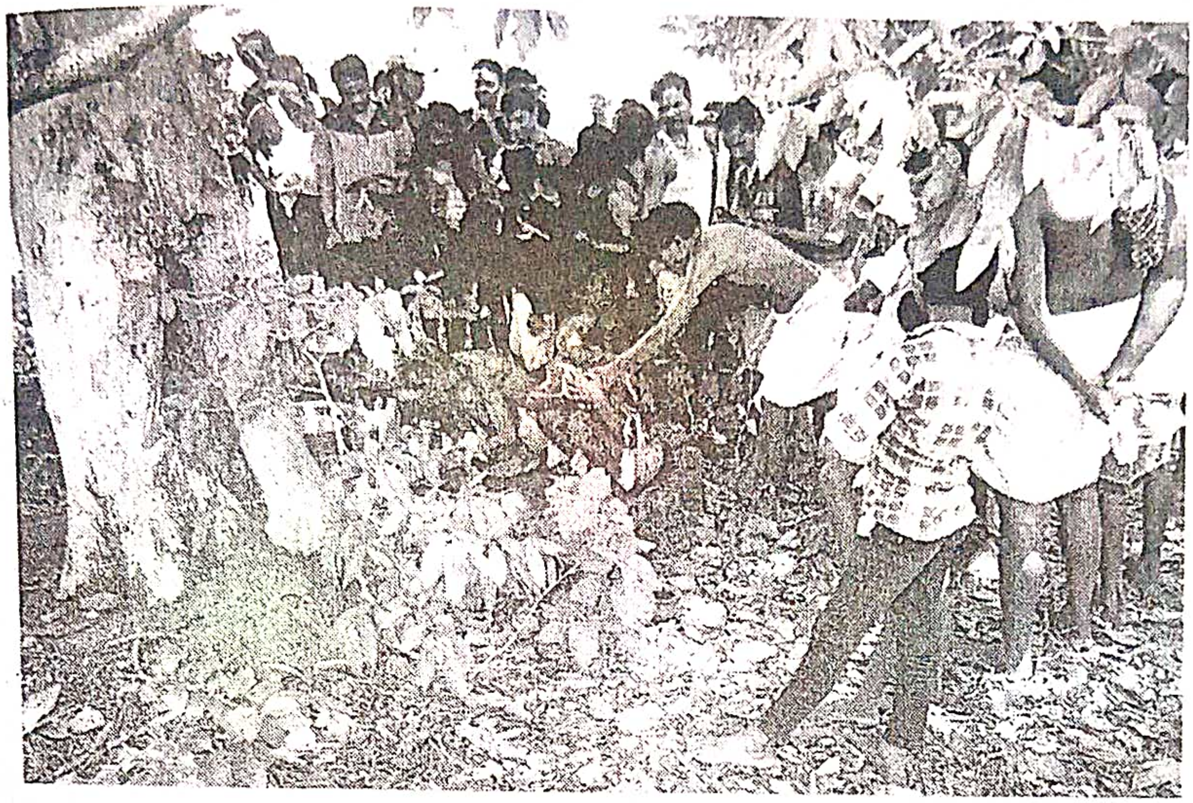
১. The Tribes and Castes of Bengal By H.H. Risley

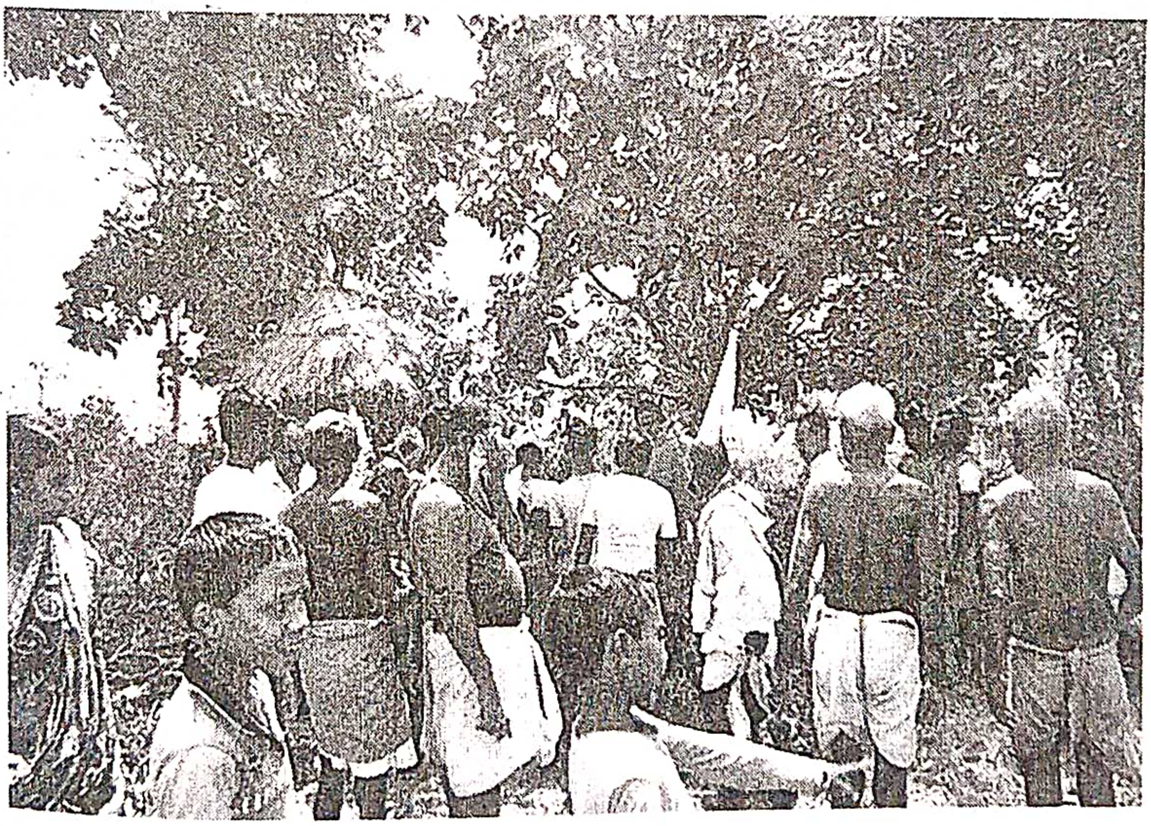
২. মূল নিবাসী বহুজন - মা ওয়ামন মেশ্রাম, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, বামসেফ

৩. কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্ম - সিরিপদঅ বঁসরিআর













মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি